৮ জুলাই ২০২০

করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংগঠন ও সংগঠকগণের প্রতি বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউটের (বাশি) আহ্বান

শ্রদ্ধেয় সংগঠকবৃন্দ,
সালাম ও শুভেচ্ছা জানবেন। এই মহামারীকালে শ্রমজীবী মানুষদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় আপনারা যে তৎপরতা চালাচ্ছেন এবং যেসব কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন, সেজন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

করোনা মহামারীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন চাকরিজীবী-শ্রমজীবী মানুষজন এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব নাই বললেই চলে। তাই তাদের জীবন, জীবিকা, চিকিৎসা কিংবা রেশন পাওয়ার মতো অতিজরুরি বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। লাখ লাখ শ্রমিক কাজ হারিয়ে বেকার, আজ তাদের অস্তিত্ব হয়ে পড়েছে বিপন্ন। অথচ এমন সময়ে তাদের পাশে না আছে মালিকপক্ষ, না সরকার। সবাই আশ্বাস দিচ্ছে, কিন্তু সহায় হচ্ছে না।

এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংগঠন ও ইউনিয়নগুলোর নিজেদের কর্মসূচির পাশাপাশি জোটবদ্ধ হয়ে সরকার ও নিয়োজকদের সাথে আলাপ করা দরকার।

আমরা মনে করি এ জন্য সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা জরুরি। আলোচনা শুরুর সুবিধা হবে এ বিবেচনায় বাশির তরফে এক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এতে সম্ভাব্য করণীয়ের তালিকাও থাকছে। প্রতিবেদনটি আপনাদের বিবেচনার জন্য পেশ করছি। দয়া করে এটিকে পরামর্শপত্র বিবেচনা না করে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব কামনার প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করলে বাধিত থাকব। আমাদের প্রস্তাবকে যদি কিছু মাত্রাতেও প্রাসঙ্গিক বোধ হয়, তবে আসুন, আমরা একত্রিত হয়ে শলা-পরামর্শ করি এবং স্থির করি আমাদের করণীয়।

করোনার প্রকোপ ও মহামারীর ঘটনায় সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছেন দেশের শ্রমজীবী ও স্বল্প আয়ের মানুষেরা। শ্রমিকদের ছাড়া চিকিৎসাসেবা দেওয়া, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস সরবরাহ, ওষুধ ও খাদ্যসামগ্রী তৈরি, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন, বন্টণ ও সরবরাহ, ব্যাংক-বীমা চালানো, সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন, শিক্ষাদান ও মূল্যায়ন, দোকান চালনা কিংবা পরিবহন সেবা দেওয়া কোনোটিই সম্ভব নয়। অথচ করোনাকালে দেখা গেল স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তি থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাওয়ার তালিকায় তারা রয়ে গেছে পেছনে।

নিয়মিত বেতন-ভাতা চালু থাকায় সরকারি খাতের শ্রমিকেরা কিছুটা ভালো আছেন। বেসরকারি খাতের শ্রমিকরা আছেন চাকরি হারানো, মজুরি হ্রাস, ছাঁটাই আর রোগাক্রান্ত হওয়ার চরম ঝুঁকির মাঝে। কৃষক

ও ছোট বণিকেরাও পণ্যমূল্য ও ক্রেতা পড়তির চাপে নাকাল। এদিকে সরকার রহিত করেছে ত্রাণ তৎপরতা। স্বল্পমূল্যে চাল-আটা-তেল বিক্রি কার্যক্রমও এক রকম বন্ধ। এ নিদারুণ পরিস্থিতি কারো অজানা নয়। তবে কয়েকটি হতাশার বিষয় হচ্ছে, সরকার তার খুব স্বল্প আকারের ত্রাণ কাজটিও চালিয়ে যেতে পারেনি। মালিকপক্ষ বা নিয়োজকেরা এই বিপদকালেও শ্রমিকদের পাশে থাকার গরজ বোধ করেননি। ক্রমাগত প্রকৃত গড় মজুরি কমার কারণে শ্রমজীবীরা আজ তাদের আর্থিক সামর্থ্য হারিয়ে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, তাদের শতকরা ৯০ ভাগের 'তিনমাস ঘরে বসে খাওয়ার' জো নেই ।

বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউট (বাশি) মনে করে, দেশ-জাতি-মানবিকতার এ দুর্যোগে শ্রমজীবী, পেশাজীবী, চাকরিজীবী মানুষ ও তাদের পরিবারবর্গ, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সুরক্ষা ও অধিকার আদায়ে শ্রমিক সংগঠনগুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তা করার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের মধ্যে উদ্দেশ্য, নীতি ও কৌশলে ভিন্নতা থাকার পরও সবার অভিন্ন লক্ষ্য হলো শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণ সাধন। এ লক্ষ্যকে আশ্রয় করে আজ একতাবদ্ধ হওয়া যায় বলে আমরা বিশ্বাস করি।

কী করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করার আগে জেনে নেওয়া যাক, করোনাকালে শ্রমিকেরা কী কী সমস্যার মুখে পড়েছে।

শ্রমিকেরা কেমন আছে

করোনা কালে শ্রমিক, কৃষক ও ছোট বণিকদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে আমরা দুটি গবেষণাপত্রের তথ্য উল্লেখ করছি। একটি পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ব্র্যাক ইনস্টিটিউট ফর গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)-র যৌথ গবেষণা 'র‍্যাপিড রেসপন্স সার্ভে : পোভার্টি ইমপেক্ট অফ কোভিড-নাইটিন' এবং অন্যটি ব্র্যাকের 'র‍্যাপিড পারসেপশন সার্ভে অন কোভিড-নাইটিন : অ্যাওয়্যারনেস অ্যান্ড ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট'। প্রথম গবেষণাটি ৪-১২ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত শহরের বস্তিবাসী এবং গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের ওপরে এবং দ্বিতীয়টি ৯-১৩ মে ২০২০ দেশের ৬৪টি জেলার নানা পেশাজীবী ও ছোট কারবারির ওপরে পরিচালিত হয়।

মাথাপিছু আয়

পিপিআরসি-বিআইজিডির গবেষণাটি বলছে, দেশজুড়ে লকডাউন ও যাতায়াতের ওপরে বাধানিষেধ আরোপের এক মাস পর, মাথাপিছু আয় গড়ে কমেছে প্রায় ৭০ শতাংশ। যা শহরাঞ্চলে ৮২ শতাংশ এবং গ্রামে ৭৯ শতাংশ।

এ গবেষণার এক মাস পর মে মাসে ব্র্যাকের গবেষণাটি অনুযায়ী গড় খানা আয় কমেছে ৭৬ শতাংশ। করোনা মহামারীর আগে গড় খানা আয় ছিল ২৪,৫৬৫ টাকা, যা লকডাউনের দুই মাস পরে কমে হয়েছে ৭০৯৬ টাকা।

কর্মহীনতা

পিপিআরসি-বিআইজিডির গবেষণা অনুযায়ী, শহর-গ্রামে শতকরা ৬৩ জন কম-আয়ের মানুষ বেকার হয়েছে। ব্র্যাকের জরিপ অনুযায়ী, গড়ে ৬২ জন কাজ হারিয়েছে বা ব্যবসা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

রোজগার কমে যাওয়ার কারণে জরিপে অংশনেওয়া শহর ও গ্রামের মানুষেরা জানিয়েছেন যে, তাঁরা ধারদেনা করে, সঞ্চয় ভেঙে এবং খাবার খরচ কমিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

দারিদ্র্য

পিপিআরসি-বিআইজিডির গবেষণা অনুযায়ী, গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ নিম্নআয়ের মানুষ উচ্চ দারিদ্র্য রেখার নিচে চলে গেছে।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শহরের ৭৮% খাদ্যবাবদ এবং ৭০% অর্থবাবদ সাহায্য নিয়েছে; এবং গ্রামের ৭১ শতাংশ খ্যাদ্যবাবদ এবং ৬৮ শতাংশ অর্থবাবদ সাহায্য নিয়েছে।

ব্র্যাকের গবেষণা অনুযায়ী, করোনা মহামারীর আগে উচ্চ দারিদ্র্যরেখার (দৈনিক আয় ১২০ টাকা ধরে) নিচে ছিল জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ যা পরে হয়েছে ৮৯ শতাংশ, এবং নিম্ন দারিদ্ররেখার (দৈনিক আয় ১০০ টাকা ধরে) নিচে ছিল ৯ শতাংশ যা পরে হয়েছে ৮৪ শতাংশ।

এ গবেষণা বলছে, পরিবারের জন্য ব্যয়ের সক্ষমতা কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষের, পিপিআরসি-বিআইজিডির গবেষণা অনুযায়ী যা শহরে ৩২ শতাংশ এবং গ্রামে ২৪ শতাংশ কমেছে।

পারিবারিক সহিংসতা

ব্র্যাকের জরিপানুযায়ী, করোনাকালে পারিবারিক সহিংসতা বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। এর মধ্যে কলহ, বর-বউয়ের ঝগড়া, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কলহ ইত্যাদি প্রধান। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা এসব কলহ-অশান্তির দায় ৫৮ শতাংশ দারিদ্র্যের, ২৩ শতাংশ পরিবারের পুরুষদের কর্মহীন হয়ে পড়ার এবং ১৭.৫ শতাংশ ছোট আবাসের মধ্যে বেশি লোকের বাস করার বাস্তবতা।

ছাঁটাই ও মামলা

শিল্প পুলিশের তথ্যানুযায়ী, গত ১৭ জুন ২০২০ পর্যন্ত তাদের অধীন ছয়টি শিল্পাঞ্চলের ১২৯টি কারখানায় ২১,৩৩১ জন কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। এর মধ্যে বিজিএমইএর সদস্য ৮৬ কারখানা, বিকেএমইএর ১৬, বিটিএমএর চার, বেপজার আট এবং অন্যান্য কারখানা ১৫টি। এটি দেশের পুরো চিত্রের একটি ছোট অংশমাত্র। পোশাক শিল্প ছাড়াও অন্যান্য শিল্প ও সেবা খাতের হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানের লাখ লাখ শ্রমিক কাজ হারিয়েছে।

পরিতাপের বিষয় যে, শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে কিন্তু শ্রম আইনের ধারা ২৬ অনুযায়ী (বরখাস্ত ইত্যাদি ব্যতীত অন্যভাবে মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরির অবসান) টারমিনেশন বেনেফিট না দিয়ে কখনো ধারা ২৭ অনুযায়ী (শ্রমিক কর্তৃক চাকরির অবসান) ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অন্যায্য ছাঁটাই, মজুরি না দেওয়া এবং কর্মস্থলে নানা জোর-জুলুমের প্রতিবাদ করায় গত মার্চের পর থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত গার্মেন্ট শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গাজীপুরে অন্তত ৬টি, সাভার-আশুলিয়ায় ৪টি, নারায়নগঞ্জে ২টি মামলা (মোট ১২টি) হয়েছে।

প্রবাসী শ্রমিকদের কাজ হারানো

জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর তথ্যমতে ১ এপ্রিল থেকে ৮ জুনের মধ্যে বিদেশে কাজ হারিয়ে দেশে ফিরেছে প্রায় ১১ হাজার শ্রমিক। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ধারণা আরো প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফিরে আসতে পারে। প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর প্রাথমিক ধারণা, বিশ্বজুড়ে অন্তত দেড় লাখ বাংলাদেশী শ্রমিক এখন কাজহারা।

বেসরকারি শ্রমিকদের বঞ্চনা

চিকিৎসা সেবা দেওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে কেউ যদি করোনা আক্রান্ত হন বা এ রোগে মৃত্যুবরণ করেন, তবে যথাযথ শর্তপূরণ সাপেক্ষে তারা ৫ লাখ থেকে ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আক্রান্ত হলে ১৫ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীরা পাবেন ৫ লাখ টাকা, ১০ম থেকে ১৪তম গ্রেডের কর্মচারীরা পাবেন সাড়ে ৭ লাখ টাকা আর ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মচারীরা পাবেন ১০ লাখ টাকা।

করোনা রোগে ভুগে হাসপাতালে মারা গেলে ১৫ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীরা পাবেন ২৫ লাখ টাকা, ১০ম থেকে ১৪তম গ্রেডের কর্মচারীরা পাবেন সাড়ে ৩৭ লাখ টাকা এবং ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মচারীরা পাবেন ৫০ লাখ টাকা।

অথচ পোশাক শিল্প, খাদ্য শিল্প, পরিচ্ছন্নতা কাজ, ব্যাংক ও মোবাইলে অর্থ লেনদেন সেবা, দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ইত্যাদিতে নিয়োজিত ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমিকেরা এমন কোনো ধরনের বীমা বা আর্থিক সুবিধা বঞ্চিত।

পাটকল শ্রমিকদের বঞ্চণা

সরকারের সিদ্ধান মোতাবেক গত ১লা জুলাই ২০২০ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলগুলো। যে শাসকশ্রেণী দেশ স্বাধীনের পর পাটকলগুলোতে দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে কখনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি, যারা বছরের পর বছর বিদেশী শাসকবর্গ, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কুপরামর্শ অনুসরণ করে দেশের পাটশিল্পকে ধ্বংস করেছে, যারা কলগুলোতে নিষ্ঠাবান শ্রমিক

ইউনিয়নগুলোকে ঠেঙ্গিয়ে বিদায় করে নীতিভ্রষ্ট ও দুর্নীতিবাজ ইউনিয়নগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই শাসকশ্রেণি আজ 'পাটকলগুলো অব্যহতভাবে লোকসান করছে' এ অজুহাত দেখিয়ে বন্ধ করে দিল। যদিও তারা এই লোকসান কাটিয়ে কলগুলোকে লাভজনকভাবে পরিচালনা করার মতো কোনো যোগ্যতা দেখাতে পারেনি। যাহোক, সরকারের এ সিদ্ধান্তে বেকার হয়ে গেছে প্রায় ২ লাখ শ্রমিক। তাদের পাওনাদি কি করে পরিশোধিত হবে, তা এখন পর্যন্ত ঠিক করা হয়নি। একবার বলা হচ্ছে তিন বছর ধরে ধীরে ধীরে শোধ করা হবে, কখনো বলা হচ্ছে নগদে পরিশোধিত হবে, কখনো এমনও বলা হচ্ছে যে, নগদে নয় বরং কয়েক বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্রে তাদের পাওনা বেতন ও চাকরির অবসানজনিত পাওনাদি দেওয়া হবে। আরো আশঙ্কার ব্যাপার হলো, করোনাকালে সনাতন পাটকলে কাজে অভ্যস্ত শ্রমিকদের নতুন কাজ পাওয়া যথেষ্ট কঠিন হবে। কারখানায় তাদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রকল্প কখনো নেওয়া হয়েছিল এমনটি জানা যায় না। পাটকল শ্রমিকদের নেতৃত্বের দাবিদার অনেক বড় বড় সংগঠন সরকারের এ অন্যায্য ও শ্রমিকহন্তা ঘোষণার পর বিক্ষুব্ধ হওয়ার বদলে মিইয়ে গেছে। যা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যর্থতার পালা হিসেবে ভবিষ্যত ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকল।

সরকার, নিয়োজক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর ব্যর্থতা

সরকার যে ত্রাণ কাজ শুরু করেছিল, তা শুরুতেই চুরি-দুর্নীতির কারণে এক লজ্জাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তবে তারপরও যতটুকু ত্রাণ বিতরণ হয়, তা জনগণের একটা বড় অংশের প্রাথমিক সমস্যা লাঘব করে। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও এই ত্রাণ কাজও জারি রাখা সম্ভব হয়নি। সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমানের তথ্য অনুযায়ী সরকার মার্চ মাস থেকে দেশজোড়া লকডাউনের পর যে ত্রাণ কাজ শুরু করেছিল তা ৪ জুন বন্ধ করে দিয়েছে। এ সময়ে মন্ত্রণালয়টি ২২ হাজার টন চাল, ৯০.১৬ কোটি নগদ অর্থ এবং নগদ ২৩.৯৪ কোটি টাকা শিশুখাদ্য বাবদ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিতরণ করেছে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'চুইয়ে পড়া নীতি' বা ট্রিকল ডাউন সিস্টেমের ওপরে নির্ভর করতে চেয়েছে সরকার। এ পদ্ধতি অনুযায়ী, সরকার মহাধনীদের অর্থসহায়তা, ভর্তুকি ও করছাড় দেবে এবং তারপর যে উন্নয়ন হবে তার সুফল কিছুটা হলেও চুইয়ে চুইয়ে শেষমেষ দরিদ্র জনগণের হাতে এসে পৌঁছুবে। অবশ্য এ পদ্ধতির সফলতা কতটুকু তা যথেষ্ট বিতর্ক সাপেক্ষ। যাহোক, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার শুরুতেই বিভিন্ন শিল্পের জন্য স্বল্পসুদে ৭২,৭৫০ কোটি টাকার ঋণদান প্রকল্প ঘোষণা করেছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে, এ ঋণদানের ফলে শিল্পকলগুলো চালু থাকবে, শ্রমিক ছাঁটাই হবে না এবং এতে ত্রাণের ওপরে জননির্ভরতা কমবে, এমন বিবেচনা থেকে সরকার এত বড় ঋণদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সময় পোশাক শিল্পের মালিকেরা শ্রমিক ছাঁটাই না করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তারা রক্ষা করেনি। বরং আরো বেশি শ্রমিক ছাঁটাই হতে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও তাঁরা জনিয়েছেন। আর অন্যান্য সেবা ও শিল্প খাতের শ্রমিক ছাঁটাই বিনা বাধায় চলমান আছে। গত ঈদে বোনাস না দেওয়ার এবং বেতন কমিয়ে দেওয়ার নজিরও হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানের।

অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, বিভিন্ন সময়ে নানা রাষ্ট্রীয় সুবিধা ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে চলেছে, সে দেশের নিয়োজকেরা ছয়টি মাসও শ্রমিকদের দায়িত্ব নিতে পারেনি। গুটিকয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।

সরকার ও নিয়োজকদের এমন আচরণের বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী প্রতিরোধ শ্রমিক সংগঠনগুলো গড়ে তুলতে পারেনি। এমনকি শিল্প রক্ষার্থে ৭২,৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা গেলেও শ্রমিকদের ত্রাণ, রেশন, চিকিৎসার জন্য কেন ১০ হাজার কোটি টাকাও বরাদ্দ হলো না, সে প্রশ্নও জোরেসোরে তোলা যায়নি। সদস্যদের রক্ষায় সংগঠনগুলো নিজস্ব তহবিল গড়ে তুলেছে কিংবা তাদের চিকিৎসা, বেকারকালীন ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য কোনো পদ্ধতি দাঁড় করিয়েছে, এমনটা শোনা যায়নি। অথচ সংগঠনগুলোর এমন উদ্যোগ থাকা খুব প্রয়োজন। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের টারমিনেশন বেনেফিট দেওয়ার দাবিটি তুলেছে গুটিকয় সংগঠন। বীমা বা আর্থিক সুবিধা দেওয়া দাবিটিও প্রাসঙ্গিক।

এ অবস্থায় শ্রমিক সংগঠনগুলো বেশকিছু কাজ হাতে নিতে পারে এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা, চিকিৎসা ও সুরক্ষার দাবিতে সরকার ও মালিকপক্ষের ওপরে চাপ তৈরি করা বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

সংগঠনগুলো যা করতে পারে

এমন জটিল পরিস্থিতিতে কেবল সরকার বা মালিকশ্রেণির ওপরে ভরসা করে বসে থাকা চলে না, নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকার প্রস্তুতি থাকা দরকার।

(১) করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় কমিটি গঠন: সংগঠনগুলো নিজে, কিংবা খাতওয়ারি বা শিল্পওয়ারি ইউনিয়নগুলো মিলে অথবা জাতীয় ফেডারেশন ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনসমূহ একত্র হয়ে স্থানীয় বা সর্বদেশ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এসব কমিটির মুখ্য কাজগুলো হতে পারে (ক) শ্রমজীবী মানুষের নানা সমস্যা চিহ্নিত করে, তা সমাধানের লক্ষ্যে আন্দোলন-দরকষাকষি করা, (খ) হাসপাতাল, পুলিশ, প্রশাসন বা স্থানীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করে শ্রমিকদের সেবা পাওয়া নিশ্চিত করা এবং (গ) পরস্পরকে সহায়তা করা।

এছাড়া কমিটি জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, সেবাদানকারী সংস্থা, নিয়োজকপক্ষ, হাসপাতাল এবং শ্রমিকদের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে কাজ করা যেতে পারে। সমস্যাক্রান্ত শ্রমিকদের দ্রুত সেবা ও সুরক্ষা পাইয়ে দেওয়া হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ তৎপরতা।

(২) তহবিল গঠন: শ্রমিকদের চিকিৎসা-ব্যয় বহন, ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের ভাতা প্রদান এবং গত মার্চের পর থেকে আন্দোলন বা সাংগঠনিক তৎপরতার কারণে শ্রমিকরা যেসব মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন তা পরিচালনা – মূলত এ তিনটি কাজের জন্য সংগঠনগুলোর নিজেদের বা যৌথ উদ্যোগে তহবিল গঠন জরুরি। তহবিলের মূল উৎস হতে পারে ইউনিয়ন বা সংগঠনের সেসব সদস্য, যারা এখনো ছাঁটাই হয়নি

বা কাজ হারায়নি। সহকর্মীর দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, দায়িত্ববোধ ও শ্রেণি সংহতি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

(৩) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সরবরাহ : কাজের পয়লা শর্ত হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কে যথাসম্ভব জেনে নেওয়া। অথচ শ্রমিকদের বাস্তব পরিস্থিতি বিষয়ে আমাদের হাতে তথ্য নিতান্তই কম। করোনার প্রকোপ শুরুর পর কত শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন, তারা কি ইউনিয়নভুক্ত নাকি ইউনিয়নের বাইরের, তারা নিয়ন্ত্রিতখাতের (ফরমাল সেক্টর) নাকি অনিয়ন্ত্রিতখাতের (ইনফরমাল সেক্টর) শ্রমিক, এক খাতের শ্রমিক কাজ হারিয়ে পেশা বদলে অন্য কোনো খাতে কাজ পেয়ে গেছেন কিনা, কত শ্রমিক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, কতজন প্রাণ হারিয়েছেন, কত জন গর্ভবতী বা প্রসূতি, জটিল রোগী হওয়ার পরও শ্রমিকদের মধ্যে কতজন চিকিৎসা পাচ্ছেন, আমাদের পরিচিত ডাক্তারদের দিয়ে ফোনে বা অন্য কোনো উপায়ে তাদের চিকিৎসা দেওয়া যায় কিনা, কত শ্রমিক মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন, কতজন জেলে, ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের কতজনের ভাতা প্রয়োজন বা কতজন নিজেই পরিস্থিতি শামাল দিতে সমর্থ ইত্যাদি বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সাদামাটা খতিয়ানও নেই আমাদের কাছে।

অন্যদিকে করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের সহায়তার জন্য কোনো তথ্যকেন্দ্র বা হটলাইন চালু করা সম্ভব হয়নি। করোনা আক্রান্ত হলে শ্রমিকেরা কোথায় যাবে, কোথায় গেলে স্বল্পমূল্যে টেস্ট করাতে পারবে, করোনা থেকে বাঁচতে কিভাবে স্বাস্থ্যসুরক্ষাবিধি অনুসরণ প্রয়োজন, অ্যাম্বুলেন্সের খোঁজ কোথায় মিলবে, ত্রাণ সাহায্য দরকার হলে জেলা বা উপজেলা প্রশাসনের কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে, জনপ্রতিনিধিদের সাথে অসহায় শ্রমিকদের যোগাযোগ হবে কিভাবে, কি উপায়ে সস্তায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেনা যেতে পারে, সন্তানের পড়াশোনায় ইউনিয়ন কিভাবে সহায়তা করতে পারে, সংসার চালাতে কোথায় স্বল্প ঋণে অর্থ মিলবে ইত্যাদি তথ্য শ্রমিকদের কাছে পরিবেশন করা খুব প্রয়োজন। অবগত থাকলে শ্রমিকরা নিজেরাই অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(৪) গণমাধ্যমের ব্যবহারঃ গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হতে পারে শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আদায়ের এক কার্যকর উপায়। এ জন্য গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন। সাংবাদিকদের কাছে শ্রমিকদের সামর্থ্য ও অসহায়ত্বের তথ্য এমনভাবে সরবরাহ করা দরকার, যাতে তারা তা সংবাদ তৈরি ও পরিবেশনে ব্যবহার করতে পারে।

কোথায় অন্যায্য শ্রমিক ছাঁটাই চলছে, কোথায় জুলুম চলছে, কোন জেলায় শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণ চুরি হয়ে যাচ্ছে, কিভাবে আইনী সুরক্ষা না দিয়ে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে ইত্যাদি তথ্য প্রতিদিন গণমাধ্যমের কাছে সরবরাহের জন্য একটি শাখা গড়ে তোলা যায়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শ্রমিকেরা ঘরে, বাইরে, কর্মস্থলে কী কী ব্যবস্থা নিতে পারে তা তাদের জানাতে এবং সমস্যার সমাধানে নিজেদের যৌথ উদ্যোগের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন, চিঠিপত্র, কলাম প্রকাশ করে প্রচার চালানো যায়। এছাড়া এ কাজে ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবের ব্যবহার তথ্যপ্রবাহ ও প্রাপ্তিকে করে তুলতে পারে বহুগুণে সহজতর।

এক গ্রুপের শ্রমিকদের অন্য শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্বশীল ও দয়ালু হওয়ার জন্য ক্রমাগত আহ্বান জানাতে হবে। পত্রপত্রিকা টিভি রেডিও ফেসবুক টুইটারে ক্রমাগত ও প্রতিনিয়ত প্রচার চালাতে হবে। যেমন: ডাক্তারদের বলতে হবে নিম্নবিত্ত শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে, পুলিশকে বলতে হবে পোশাক শ্রমিকদের প্রতি সদয় হতে, শিক্ষকদের বলতে হবে শ্রমিকদের সন্তাদের ব্যাপারে আরো যত্নবান হতে এবং সব শ্রমিকদের বলতে হবে অধস্তনদের প্রতি সদয় হতে।

কাজ বন্ধ অবস্থাতেও শ্রমিকদের যথাসাধ্য বেতন দেওয়ার জন্য নিয়োজকদের আহ্বান জানানোর জন্য গণমাধ্যমের ব্যবহার করা যেতে পারে। পুঁজিবাদী সামাজে একজন শ্রমিকও অপরের নিয়োজক হতে পারে। যেমন: সাংবাদিকের বাসার গৃহকর্মী। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে দ্রুত সুফল এনে দিতে পারে।

(৫) শালিস: ইউনিয়নের বা সংগঠনের সদস্যদর পারিবারিক কলহ ও সহিংসতা রোধে সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং তা করাও প্রয়োজন।

(৬) চিকিৎসা: করোনা কালে গর্ভবতী ও প্রসূতি শ্রমিক এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে ইউনিয়নগুলোর কাজ আরো বিস্তৃত করা দরকার। এ জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা যায় কি?

(৭) কাজের খোঁজ দেওয়া: করোনাকালে কর্মহীন শ্রমিকদের নতুন কাজ পাইয়ে দিতে, শ্রমিক-অধিক জায়গা থেকে শ্রমিক-স্বল্প এলাকায় যাওয়ার জন্য শ্রমিকদের তথ্য সরবরাহ করে, শ্রমিকদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ চালুর মাধ্যমে শ্রমিকদের কিছু সমস্যা লাঘব করা যেতে পারে।

সরকারের সাথে আলোচনা

পোশাক শিল্পে উদ্দীপনা প্রকল্প থেকে অর্থবরাদ্দের সময় সরকার যে শ্রমিক ছাঁটাই না করার শর্ত জুড়ে দিয়েছিল, সেজন্য সরকার অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। সরকারি শ্রমিকদের জন্য যে আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে, সেটির জন্যও সরকারের ধন্যবাদ প্রাপ্য। তারপরও পোশাক খাতে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। অন্যান্য খাতেও ছাঁটাই চলছে। এমন অবস্থায় শ্রমিক সংগঠনগুলোকে নিজেদের কাজ করার পাশাপাশি সরকারের সাথেও নানা বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সরকারের কাছে কিছু আশু কিছু দীর্ঘমেয়াদী দাবি তুলে ধরা যায়। করোনাকালেও শ্রমিকদের দারিদ্র্যদূরীকরণ, মানবসম্পদের বিকাশ এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কাজ যাতে ব্যহত না হয়, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

১. সরকার চেয়েছিল মালিকদের উদ্দীপনা তহবিল (৭২,৭৫০ কোটি টাকার ঋণদান প্রকল্প) দেওয়ার মাধ্যমে শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে। অথচ নানা কারণে তা ভেস্তে যেতে বসেছে।

মালিকরা কথা রাখছেন না বা রাখতে পারছেন না। ছাঁটাই চলছে। অনেক প্রতিষ্ঠান বাজারের নিয়ম মেনে চলতে না পেরে বসে পড়ছে। কর্মহীন হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক ও ছোট বণিকেরা। সরকারের কাছে দাবি জানাতে হবে, কর্মহীন শ্রমিক ও অন্যান্যদের জন্য জরুরিভিত্তিতে ভরণপোষণ ভাতা চালু করার। গার্মেন্টসহ অন্যান্য খাতের সদস্য বেকার শ্রমিকদের সরকার থেকে অন্তত মূল বেতনের সমান অর্থসহায়তা দেওয়া কর্মসূচি চালু করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

২. এছাড়া সরকার নানা ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহজ শর্তে বিশেষ ঋণদান কর্মসূচি চালু করতে পারে। ইতিমধ্যে এ ধরনের কিছু ঋণদানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তবে তো আরো ছড়িয়ে দেওয়া দরকার, যাতে স্বল্প আয়ের শ্রমিকরা প্রতি মাসে ১০-১৫ হাজার টাকা ধার নিতে পারবে এবং তা দীর্ঘ কিস্তিতে ধীরে ধীরে শোধ করার সুযোগ পাবে।

৩. শ্রমজীবী মানুষেরা নানা প্রয়োজনে ব্যাংক, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, এনজিও ও মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নেয়। করোনা পরিস্থিতিতে ঋণাদায় শিথিল করার জন্য সরকারের তরফে যাতে নির্দেশ জারি হয়, সে আহ্বান জানানো দরকার।

৪. শ্রমিকদের জন্য কেবল ১০ টাকা মূল্যে চাল কিংবা ওএমএসে চাল-আটা-তেল বিক্রি করলে চলবে না, দেশের প্রতিটি বাজারে সরকারি উদ্যোগে 'পুলিশ রেটে' রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা চালুর জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো দরকার। ওইসব রেশন দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যেমন চাল, ডাল, তেল, নুন, পেঁয়াজ, রসুন, ওষুধ ও সাবান, স্বল্পমূল্যে নিম্নবিত্ত মানুষদের কাছে বিক্রির কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। প্রয়োজনে রেশন কার্ডের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ কাজে সরকার যে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী থেকে শুরু করে আনসার এবং স্কাউটদেরও কাজে লাগিয়ে দ্রুত কাজ সারতে পারে, সেটি জানিয়ে রাখাটিও বোধ করি বাহুল্য হবে না।

৫. খুব প্রবলভাবে এ দাবিটি এখন তোলা প্রয়োজন যে, ট্রেড ইউনিয়ন করার সব বাধা সরিয়ে নিতে হবে। সংগঠকদের ওপরে দমন-পীড়ন ও হামলা-মামলা বন্ধ করতে হবে। ইউনিয়নগুলোকে শ্রমিকদের পাশে থেকে তাদের কল্যাণে কাজ করতে দিতে হবে। দেশের প্রতিটি কর্মস্থলে আজ অবাধ ও গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন চর্চার সুযোগ থাকলে শ্রমিকদের এত দায়িত্ব সরকারকে নিতে হত না এবং ইউনিয়নগুলো স্বউদ্যোগে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারত।

৬. সরকারকে এমন অনুরোধ করা যায় যে, সে যেন মহামারী কালে শ্রমিক ছাঁটাই না করার নির্দেশ জারি করে। মালিকেরা যাতে খুব দরকার না হলে কর্মীদের ছাঁটাই না করে এবং কর্মস্থলে শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা নেয়, সেজন্য সরকার অনুরোধ করতে পারে। সরকারের মাধ্যমে মালিকদের কাছে এমন দাবি তোলা যায় যে, আপতত লেঅফ এবং ছাঁটাই করলেও পরে শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হলে শ্রম আইনের ধারা ২১ অনুযায়ী

'ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পুনঃনিয়োগ' বাস্তবায়ন করতে হবে অর্থাৎ আগে পুরান শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিতে হবে। এ ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, তা তদারক করতে সরকারকে চাপ দিতে হবে।

৭. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য, বাড়িভাড়া ও বিদ্যুৎবিল যাতে না বাড়ে সে জন্য সরকারকে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। ছাত্রদের স্কুল-কলেজ-কোচিং সেন্টার-টিউশনি ইত্যাদির বেতন কমিয়ে দেওয়া, সমস্যাক্রান্ত পরিবারের বাড়িভাড়া মওকুফ ইত্যাদির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা যায়।

৮. শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বাড়াতে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো যেতে পারে। নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি, প্রয়োজনে সরকারি উদ্যোগে নতুন কল-কারখানা স্থাপন, কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর কাজ ইত্যাদি করতে হবে। অনুৎপাদনশীল খাতের বরাদ্দ উৎপাদনশীল খাতে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া যায়। অর্থাৎ এ জরুরি সময়ে মেগা ডেভেলপমেন্ট কাজের বদলে কৃষি ও শিল্পখাতের এমন প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো যেতে পারে যাতে কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ে। শ্রমিকরা যেহেতু সমাজের বৃহত্তর অংশ, তাই তাদের কল্যাণ হলে পুরো সমাজের কল্যাণ হবে এবং তাদের ভালো থাকার সাথে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও শান্তি-সমৃদ্ধির প্রশ্ন জড়িত, এ কথা সরকারকে বুঝিয়ে বলা দরকার।

৯. করোনা কালে অত্যন্ত বিপজ্জনক জেনেও যে শ্রমিকেরা কাজ করে চলেছেন, তাঁদের জন্য অবিলম্বে সরকারি শ্রমিকদের অনুরূপ ক্ষতিপূরণ, বীমা ও অর্থসহায়তার স্কিম চালু করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানানো যেতে পারে।

১০. করোনা পরিস্থিতির কারণে যে শ্রমিকেরা প্রবাসে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বা অর্থকষ্টে ভুগছেন, দ্রুত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে তাঁদের খুঁজে বের করে তাঁদের কাছে খাবার ও চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারে বলা যায়।

১১. করোনাকালে পরিচ্ছন্নতাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবহনকর্মী, সরবরাহকর্মীর মতো অতিজরুরি সেবাপ্রদানকারী শ্রমিকদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ব্যবস্থা করার ঘোষণা দেওয়ার একটা ঘোষণা যাতে সরকার দেয়, সে জন্য তাকে অনুরোধ করা দরকার।

১২. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিবিরোধী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া শ্রমিক সংগঠনগুলোর নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন। দুর্নীতি, অগণতান্ত্রিকতা এবং জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি সারা দুনিয়ার সব শ্রমিকদের জন্যই চরম ক্ষতিকর। চিকিৎসা ও সেবাদান, সরকারি ক্রয় ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ত্রান বন্টণ, শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা দান ইত্যাদি কাজে দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ করতে সরকারকে আরো কঠোর ভূমিকার রাখার প্রস্তাব দেওয়া যায়।

১৩. সরকারকে মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষার কথা বলে শ্রমিকদের বাক স্বাধীনতা হরণ, সংবিধান-স্বীকৃত সংগঠন, দরকষাকষি ও প্রতিবাদ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না। বরং সব শ্রমিকের নিরাপদ চলাফেরা ও কাজ নিশ্চিতে সরকারকে আরো উদ্যোগী হতে হবে, এ কথা জোর গলায় বলা যায়।

মালিকদের কাছে বক্তব্য

করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিকস্বার্থ রক্ষায় মালিকদের নানা সংগঠন যেমন: বাংলাদেশ ইমপ্লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, চেম্বার অব কমার্স, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ইত্যাদির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে। উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক প্রয়োজন। অথচ করোনা মহামারীর মতো বিপদে মালিকেরা যদি শ্রমিকদের পাশে না থাকেন কিংবা শ্রমিকেরা যদি এমনটি ভাববার সুযোগ পায় যে, তাদের বিপদের দিনে মালিকেরা কেবল নিজেদের সুবিধাটাই খেয়াল করছেন, শ্রমিকদের দিকটি বিবেচনা করছেন না, তবে সেটি যে সুষ্ঠু শিল্প-সম্পর্কের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর হবে, তা মালিকদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। মিটিং, সভাসমাবেশ, প্রচারপত্র বিলি, চিঠিপত্র, ফেসবুক, গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়াসহ নানা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে মালিকদের কাছে আহ্বান জানানো যায় যে :

১. শ্রমিকদের প্রতি মানবিক হোন, দয়ালু হোন

২. কর্মস্থলে শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতে দিন, যাতে ইউনিয়নগুলো নিজেদের ফান্ড থেকে শ্রমিকদের সহায়তা করতে পারে

৩. খুব প্রয়োজন না হলে শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করবেন না। যদি করতেই হয় টারমিনেশন বেনেফিট দিন এবং পরে প্রয়োজন হলে এদের থেকেই নিয়োগ দিন।

৪. কর্মস্থলে শ্রমিকরা যাতে পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী পায় এবং নিরাপদে কাজ করতে পারে, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। করোনা-আক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যয় যথাসাধ্য বহন করুন।

৫. করোনা দুর্যোগে কাজ হারিয়ে শ্রমিকেরা পরিবার-পরিজনসহ ভীষণ সমস্যায় পড়ে যায়। তাই একটি কল বা ইউনিট বন্ধ হলে প্রয়োজনে বেকার হওয়া শ্রমিকদের অন্যত্র কাজের সুযোগ করে দিন।

৬. বাংলাদেশ আমদানী-নির্ভর দেশ। করোনাকালে বিদেশী পণ্য আমদানী হচ্ছে কম। এ সুযোগে সেসব পণ্য উৎপাদনের জন্য দেশে কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হলে তাতে বাণিজ্য যেমন বাড়বে, কর্মসংস্থানও হবে প্রচুর। তাই উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান, আপনারা নতুন কাজ সৃষ্টি করুন, পরিবেশবান্ধব শিল্প ও কারখানা গড়ে তুলুন। শ্রমিক সংগঠনগুলো আপনাদের সাধ্যমতো সহায়তা করবে।

শেষ কথা

শ্রমিক সংগঠনগুলোর যৌথ উদ্যোগ নেওয়া এখন সময়ের দাবি। একজোট হয়ে করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হলে সংগঠনগুলোর সক্ষমতাও অনেক বেড়ে যাবে। এমন উদ্যোগ শ্রমিকদের শ্রেণিসংহতি বাড়বে এবং শ্রমিকদের সংগঠনগুলো যে তাদের সুরক্ষায় সংগঠনের ভেতরে-বাইরে দু দিকেই কাজ সমানে করতে পারে, তা দেখে-বুঝে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। যা তাদের আরো উদ্যোগী, সাহসী, সহমর্মী হয়ে উঠার সুযোগ করে দেবে।

আমাদের প্রস্তাবগুলো খসড়া মাত্র। এগুলো নিঃসন্দেহে আরো বিবেচনার দাবি রাখে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের উপলব্ধি হলো, আজ আমাদের ওপরে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা পালনে ব্যর্থ হওয়া চলবে না। আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো একতা, আর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো নিজেদের শক্তি সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত না থাকা।

বাংলাদেশে শ্রমজীবী-পেশাজীবী জনগণের মঙ্গলে বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউটয়ের (বাশি) প্রতিষ্ঠা। শ্রমিকদের কল্যাণে পরিকল্পিত যে যেকোনো কাজকে তথ্য, পরামর্শ, প্রশিক্ষণসহ সাধ্যমত সব কারিগরি ও ব্যবহারিক সহযোগিতা দেবে বাশি।

আমরা শ্রমিক, আমরা রোজগার করি। বুদ্ধি ও শরীর খাটিয়ে আমরাই পৃথিবীর তাবৎ কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জ্ঞান ও আর্থিক সামর্থ্য আমাদের আছে। হয়ত একজন ব্যক্তি হিসেবে আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য, মেধা ও মননশীলতা খুব বেশি নয়। কিন্তু আমরা তো একা নই, হাজার হাজার, লাখ লাখ। আমরা এক হলে কার সাধ্য আমাদের ঠেকায়। ভুললে চলবে না যে, একজোট হলে আমরা যেকোনো বাধা জয় করতে সক্ষম।

ধন্যবাদ,
বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউটের পক্ষে,

(শাহ্ আতিউল ইসলাম)
সভাপতি, ট্রাস্টি বোর্ড, বাশি
ফোন: 01736-038798
ইমেইল: info@bashibd.com

বাশির তথ্য বিষয়ে যোগাযোগ করতে পারেন: গোলাম মুর্শেদ (গণযোগাযোগ দপ্তর), ফোন: 01558-102383, 01707-969096, ইমেইল: murshedpost@gmail.com, ফেসবুক: Ghulam Murshed Milon